ভারতীয় সঙ্গীতের সারগ্রন্থ 'সঙ্গীতরত্নাকর' ও তার বঙ্গানুবাদ

সাগ্নিক আতর্থী

সঙ্গীত, শাস্ত্র, অনুবাদ: আধুনিক ইতিহাস

> গৌরীপুর পৌঁছেই রোজকার কাজের একটা তালিকা বানালাম আর তা কঠোরভাবে পালন করবার ব্রত নিলাম। দাদামশাই স্থির করেছিলেন সংস্কৃত সঙ্গীত রত্নাকর অনুবাদ করবেন। যখন গৌরীপুর পৌঁছলাম, সেই কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমাকে তিনজনের কমিটিতে যোগ দিতে বলা হলো যার সদস্য ছিলেন মাতামহ (ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী), অপেশাদারী সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীজ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, যাঁর সঙ্গীতের ঔপপত্তিক অংশে গভীর জ্ঞান, বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, যিনি সঙ্গীতের বিষয়ে তেমন কিছুই জানতেন না। তিনিই আসল অনুবাদক। তাঁদের সাহায্য করবার জন্য কমিটিতে যোগ দিলাম। এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আমি, কিন্তু দাদামশাই দুটো কারণে আমাকে এই কাজে যুক্ত করলেন। এক, তাঁদের সাহায্য করার জন্য, দুই, যাতে মুল গ্রন্থটি বিশদভাবে পাঠ করার সুযোগ পাই। এই কাজে উৎসাহিত হলাম।[১]

উপরের অংশটি উস্তাদ এনায়েৎ খাঁর শিষ্য সেতারী, সঙ্গীতশাস্ত্রী বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর আত্মজীবনী থেকে পাই। অধুনা বাংলাদেশ-এর ময়মনসিংহ অন্তর্গত গৌরীপুর-এর জমিদার, পৃষ্ঠপোষক ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংস্কৃত সারগ্রন্থ সঙ্গীতরত্নাকর অনুবাদের এই উদ্যোগ নেন ১৯৩০-এর দশকে। রাগসঙ্গীত চর্চা এবং আলোচনাকে কেন্দ্র করে একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক গণপরিসর তৈরী হওয়ার দিক দিয়ে সময়টা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই অবশ্য সঙ্গীতলেখন ও তার মাধ্যমে একটি পাবলিক গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। এর পেছনে দুটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কাজ করে। এক, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের কলকাতায় আগমন। তার সঙ্গে মেটিয়াবুরুজ দরবারে আসেন অনেক হিন্দুস্থানী ওস্তাদ, বাংলায় রাগসঙ্গীত শিক্ষা এবং সম্প্রসারণে যাঁদের ভূমিকা প্রধান। শহরের অপেশাদারী, অভিজাতদের রাগ সঙ্গীতের ক্রিয়াত্মক ও ঔপপত্তিক চর্চার একটি স্বল্পপরিসর গড়ে ওঠে

প্রধানত এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। দ্বিতীয়ত উনিশ শতকের গোড়া থেকেই মুদ্রণ সংস্কৃতি এবং প্রাচ্যবাদী বিদ্যাচর্চার যুগ্ম প্রভাবে শুরু হয় সঙ্গীতশাস্ত্র চর্চা ও আধুনিক গ্রন্থনির্মাণ। বঙ্গদেশে মিউসিকলজির জনক শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর-এর লেখায় ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবাদী বিদ্যাচর্চার প্রভাব অনস্বীকার্য। উইলিয়াম জোন্স্ থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক 'হিন্দুসঙ্গীত' সংক্রান্ত মতামত বিচার করে সঙ্গীতের যে তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক কাঠামোটি তিনি নির্মাণ করেন তা হল: প্রাচীনকালে হিন্দু সভ্যতায় সঙ্গীতের একটি অবিমিশ্র ধারা ছিল, উপমহাদেশে ইসলাম-এর আগমনে যার অবক্ষয় হয়। পুরাকালে সঙ্গীতের আধার ছিল সংস্কৃত গ্রন্থগুলি যা ইসলামিক সংস্কৃতিতে অমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। মুসলিম পেশাদারদের হাতে সঙ্গীত পরিণত হয় ব্যবসায়, আর তার ফলে লোপ পায় সঙ্গীতের ঔপপত্তিক, বৌদ্ধিক চর্চার ইতিহাস। সুতরাং আধুনিক সংস্কারকদের ভূমিকা লুপ্ত সঙ্গীতের আকর সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের পুনরুদ্ধার। এই চিন্তার মধ্যেই ইদানীংকালের ঐতিহাসিকেরা ঔপনিবেশিক বিষয়ী ভাবনার রূপ বা প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেন।[২]

উনিশ শতকীয় মুদ্রণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অবশ্য কয়েকটি পার্থক্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই শতাব্দীর অন্তত গোড়ার দিকের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে বিমিশ্র ফার্সি সংস্কৃতির প্রভাব থেকে যাচ্ছে, যেমন রাধামোহন সেনদাসের সঙ্গীততরঙ্গ-এ (১৮১৮)।[৩] দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর অন্যভাগে প্রাচীন শাস্ত্র পুনরুদ্ধারের বাতিক দেখা গেলেও, খুব কম সংখ্যক সারগ্রন্থই মূল থেকে আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ হয়েছে। বরং বিভিন্ন সময়ে রচিত এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ঘেঁটে আধুনিক সঙ্গীত তাত্ত্বিকেরা তার নতুন রূপ দিচ্ছিলেন, ঘটাচ্ছিলেন ভাষান্তর। আর এই সব শাস্ত্র আলোচনা আর তার অনুবাদ প্রকল্পে সৃষ্টি হচ্ছিল প্রবল মতবিরোধ। প্রথমত, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন আধুনিক মনস্ক সঙ্গীততাত্ত্বিক শাস্ত্র পুনরুদ্ধারে একইভাবে উজ্জীবিত হননি এবং এর মধ্যে সঙ্গীত বহির্ভূত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী রাজনীতিও তিনি লক্ষ্য করে থাকেন।[৪] দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠোদ্ধার আর তার মাধ্যমে সঙ্গীতের পরিভাষা ও তাত্ত্বিক আলোচনায় থেকে যায় মতান্তর। জ্ঞানচর্চায় অনেকেই শৌরিন্দ্রমোহন আর তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল মিউজিক স্কুলের (১৮৭১) আধিপত্য মেনে নেননি। যেমন বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ, যিনি শার্ঙ্গদেবকৃত সঙ্গীতরত্নাকরের একটি আধুনিক সংস্কৃত সংস্করণ (১৮৭৯) প্রকাশ করেন। রত্নাকরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন:

> The 3rd chapter explains the three principal *Grámas* (scales), their *Múrchhánás,* the Kramas and the Tánas...This with its preceding chapter will help the readers in removing at once the wrong ideas they might have formed from the several misrepresentations made to them of the same by the author of "The Six Principal Rágas" and "Yantrakshetra Dípica" and by some other contemporaries who have written on the subjects, for it will be at once obvious to the reader, that, not

only the definitions given by our learned contemporaries of the *Suddhasvaras, Vikritasvaras, Śrútis, Grámas, Múrchhánás...* are totally erroneous, but the translations of a few passages from this *SangítaRatnákara* in support of some of those definitions in the above named two books by Dr. Sourendra Mohun Tagore are very far wrong.[৫]

বিশুদ্ধতা আর উৎস সন্ধানের পাশাপাশি সঙ্গীতের একটি আধুনিক পরিভাষা গঠনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতশাস্ত্র ও তার অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রাধান্য পায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত শার্ঙ্গদেবকৃত সঙ্গীতরত্নাকর।

রত্নের আকর

আর পাঁচটা শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে বাঙালী সঙ্গীতবিজ্ঞানীদের কাছে সঙ্গীতরত্নাকর প্রধান স্থান পেল কেন তার উত্তর খোঁজা খুব একটা কঠিন নয়। এই শাস্ত্রটি রচিত হয় আনুমানিক ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে, যাদবরাজ সিংঘনের দরবারে। গ্রন্থের রচয়িতা শার্ঙ্গদেব নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছেন রত্নাকরএ। তিনি কাশ্মীর দেশ থেকে আগত সংস্কৃত পণ্ডিত, দক্ষিণে যাত্রা করেছিলেন, পৌঁছেছিলেন মহারাষ্ট্রীয় যাদবরাজ সিংঘনের দরবারে। শার্ঙ্গদেব ছিলেন এই রাজার দরবারে প্রধান হিসাবরক্ষক। অন্যদিকে তিনি সফল এক আয়ুর্বেদ চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁর গ্রন্থটি অন্যান্য বহু প্রাচীন সঙ্গীত সম্বন্ধীয় শাস্ত্র মতের নির্যাস।

রত্নাকর আলোচনা প্রসঙ্গে চলে আসে আরো প্রাচীন, ভরতের নাট্যশাস্ত্রও। এ দুটি শাস্ত্রের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত মতঙ্গ-এর বৃহদ্দেশীর কথা। নাট্যশাস্ত্র বা দত্তিলমুনির দত্তিলম-এ সঙ্গীতের আলোচনা আসে ক্লাসিকাল সংস্কৃত নাটকের সূত্রে, তার থেকে আলাদাভাবে নয়। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত মাতঙ্গ-এর বৃহদ্দেশীর মধ্য দিয়ে দেখা যায় ভাষা, বৌদ্ধিক চর্চার ধারা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পট পরিবর্তন। বৃহদ্দেশী বা তার পরবর্তীকালে রত্নাকর এমন সময়ে রচিত যখন সংস্কৃত কেন্দ্রিক বিশ্বজনীনতা ও লৌকিকতার সীমাবদ্ধতা দেখা গিয়েছে ও তার পরিবর্তে আসছে স্থানীয় ভাষাভিত্তিক ভার্নাকুলার সহস্রাব্দ। সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থ রচনায়ও পড়েছে এর প্রভাব। বৃহদ্দেশীতেই আমরা পাই 'মার্গ' (পথ) এবং 'দেশী' (স্থান) সংক্রান্ত দ্বৈত ভাবনা। মার্গ ও দেশীর এই বিভাজিকার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠছে সংস্কৃত শাস্ত্রের নতুন তাত্ত্বিক পরিকাঠামো। এ প্রসঙ্গে শেল্ডন পোলক লিখছেন, 'Not only a new semantics but also a new episteme of cultural regionality is sedimented in the history of the marga-desi distinction'.[৬] মার্গ হল যা সংস্কৃত শাস্ত্রের নিরিখে মূল, আদি, অপরিবর্তনীয়; দেশী অর্থাৎ স্থানিক বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি, যার সম্প্রসারণ ঘটেছিল এই সময়। আর সেই সব স্থানীয় ঐতিহ্যের ধারাগুলিকে একটি তাত্ত্বিক ধাঁচার মধ্যে এনে ফেলাই ছিল শাস্ত্রগত প্রয়াস। রত্নাকর-

এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি কেবলমাত্র পুরনো মতের সংশ্লেষ নয়, বরং সঙ্গীত ধারার সম্প্রসারণ। যেমন নাট্যশাস্ত্রের স্বল্প সংখ্যক মার্গ তালের পরিবর্তে বহু সংখ্যক দেশী তালের অন্তর্ভুক্তি, আর একইভাবে গ্রাম রাগের তালিকায় দেশী রাগের আত্তীকরণ।

জোনাথন ক্যাৎজ-এর মতে প্রাক-আধুনিক ভারতে সংস্কৃত শাস্ত্র নির্ভর সঙ্গীতের বৌদ্ধিক চর্চা ও এস্থেটিক্স-এর একটি স্বায়ত্ত ধারা[৭] গড়ে উঠেছিল, সঙ্গীতের প্রয়োগ বা ক্রিয়াত্মক চর্চার থেকে পৃথকরূপে। অবশ্যই থিওরি এবং প্র্যাক্টিস-এর মধ্যে সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রপ্রণেতা এবং সংকলক-রা একটা প্রভেদ টানেন লক্ষ (ক্রিয়াত্মক) এবং লক্ষণ (ঔপপত্তিক) এর মধ্যে। এই দ্বৈত চিহ্ননে লক্ষ-এর স্থান লক্ষণ-এর ওপর কারণ শাস্ত্র হল যা চিরন্তন সত্য, লক্ষণ-এর মধ্যেই মূর্ত লক্ষ। প্রাচীন সঙ্গীত মৎ, দেশ, কাল-এর গণ্ডি দ্বারা সীমাবদ্ধ সঙ্গীত ও সঙ্গীত ক্রিয়াকে একটি তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, নান্দনিক কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করাই হল শাস্ত্রের . ব্যাশনাল। আর তার মধ্য দিয়েই রূপান্তর এবং নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গীত রত্নের আকরগ্রন্থ সঙ্গীতরত্নাকর যেমন একদিকে প্রচলিত সঙ্গীত এবং সঙ্গীত মতের শ্রেণীবদ্ধকরণ, তেমনিই তার শব্দার্থের সম্প্রসারণ। রত্নাকর-এর প্রভাব এবং নকশাটাই পরবর্তীকালে প্রাক-আধুনিক এবং আধুনিক অনেক শাস্ত্র রচনায় থেকে যাবে (উদাহরণস্বরূপ, সপ্তদশ শতাব্দীর দামোদর কৃত সঙ্গীতদর্পণ)। চতুর্দশ শতাব্দীতে ঘুনিয়ত অল-মুনিয়া নামে সঙ্গীতরত্নাকর ফার্সিতে অনূদিত হয় আর ষোড়শ শতাব্দীর মারাঠী এবং দাক্ষিণাত্যের ভাষায় এর অনুবাদ পাওয়া যায়। সঙ্গীতরত্নাকর এমন একটি সময়ে লেখা যখন ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম এবং ইসলামীয় সংস্কৃতির আগমন ঘটে গেছে। প্রচলিত ভাবনায় এর ফলে সঙ্গীতের একটি ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব আর দক্ষিণ ভারতে সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। সংকীর্ণ ভাবনায় ইসলামি আমলে সঙ্গীতবিদ্যা চর্চার ধারাটাই লোপ পায়। ইদানিং ইতিহাস গবেষণা, বিশেষত মুঘল ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস অবশ্য দেখায় এই সময় সংস্কৃত চর্চার ধারা একেবারেই লোপ পায়নি; বরং ফার্সি-সংস্কৃত মিলিয়ে আর অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে থেকে গেছে বিমিশ্র সংস্কৃতির রেশ।[৮] উত্তর ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরা যাকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে classicization বলছেন সেও ঔপনিবেশিক আধুনিকতার কোনো নতুন প্রকরণ নয়, যদিও আধিপত্যবাদী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ। মুঘল যুগের সঙ্গীত সক্রিয়তা আর সামাজিকতার মধ্যেও এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।[৯]

রত্নাকরের বঙ্গানুবাদ: বিভিন্ন পর্যায়

আগেই দেখেছি উনিশ শতকে রত্নাকরের অনুবাদ আর তার মধ্য দিয়ে সঙ্গীতের উপস্থাপন ও পরিভাষা গঠনকে কেন্দ্র করে তৈরী হচ্ছে বিভেদ। রত্নাকরের আক্ষরিক অর্থে কিন্তু বঙ্গানুবাদ হচ্ছে না। ১৮৭২ সালে নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে সঙ্গীতরত্নাকর লিখছেন তা হল রাগবিবোধ, দামোদর, নারায়ণ ও রত্নাকর

এবং বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থের সারসঙ্কলন। এই বইটি শৌরিন্দ্রমোহনকে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর ভাবধারায় পরিপুষ্ট। এর পরেই ১৮৭৯ সালে কালীবর বেদান্তবাগীশ ও সারদাপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত সিমহভূপাল-এর টিকাসহ রত্নাকরের মূল সংস্কৃত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধে সম্পাদক লেখেন, 'There has been of late some desire among not a few Bengalis and Europeans to, of having a correct idea of the principles of Hindu Music. Accordingly, attempts have been made by some to explain these, but too hastily and carelessly, we think, to terminate satisfactorily. Books and pamphlets have been written — institutions opened — but the results are not very encouraging...The great mischief done is in alleging that most of the erroneous statements are supported by Sanskrit Authorities, when, in fact, they are not so, and in frequent misrepresentations of passages from more than one Sanskrit works.'[১০] এর পরে বিংশ শতকে রত্নাকরের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের উদ্যোগ নেন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। পাণ্ডুলিপিটি অপ্রকাশিত থেকে যায়।

সঙ্গীতরত্নাকরের সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই বই ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র ঢাকার প্রখ্যাত তবলাবাদক কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভ্রাতা। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ-এর সচিব, 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী', 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান', 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এই অনুবাদটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তাঁকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন কেশবচন্দ্র ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী। ধরে নেওয়া যেতে পারে ব্রজেন্দ্রকিশোর-কৃত রত্নাকরের অপ্রকাশিত বঙ্গানুবাদটি তিনি দেখে থাকবেন, যদিও তার উল্লেখ এই গ্রন্থে কোথাও মেলে না। গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ করেছেন ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৩-র মধ্যে অনূদিত মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত চার খণ্ড সাত অধ্যায় বিস্তৃত সংস্কৃত সঙ্গীতরত্নাকর আর ইংরেজী গ্রন্থগুলির মধ্যে সি কে রাজার সঙ্গীতরত্নাকর প্রথম অধ্যায়-এর অনুবাদ।

প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে অনুবাদের সব দিক আলোচনা করা সম্ভব নয় আর তা উদ্দেশ্যও নয়। বরং দেখা যাক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সময় সঙ্গীত ভাবনা ও ইতিহাস চিন্তায় কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে আর তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই গ্রন্থ নির্মাণে। উপক্রমণিকা অংশে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের একটা লম্বা ভূমিকা দেওয়ার সূত্রে সুরেশচন্দ্র লিখছেন, 'এই পর্যন্ত আমরা ভারতীয় সঙ্গীতের কথা বলিয়াছি, হিন্দু সঙ্গীতের নহে। 'হিন্দু সঙ্গীত' শব্দটির তাৎপর্য্যবোধ দুরূহ; কারণ, ভারতে নানা অবস্থান্তরের মধ্যে যে সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, তাহাকে খাঁটি হিন্দু সঙ্গীত বলা চলে না; উত্তর ভারতের সঙ্গীতে মুসলমান প্রভাব যেমন স্বাভাবিক, দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতে তেমনই দ্রাবিড় প্রভাব সম্ভবপর। ভারতীয় সঙ্গীত

ভারতীয় সঙ্গীত; ইহাকে হিন্দু, মুসলমান বা দ্রাবিড় সঙ্গীত নামে অভিহিত করা যায় না। বস্তুতঃ এই সঙ্গীত বিমিশ্র (composite)।"[১১] অনুবাদ কার্যে আরেকটি বিষয় তাঁর খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে এসেছে। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে বর্তমান চর্চা বা আলোচনার সম্পর্ক কি? সে প্রসঙ্গে লিখছেন,

> প্রশ্ন হইতে পারে —বর্তমান যুগে প্রাচীন কালের সঙ্গীতশাস্ত্রের চর্চার আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নটি তেমনই হাস্যকর যেমন কেহ যদি বিবাহের প্রস্তাবে প্রশ্ন করে — পাত্রটি বহু অর্থ উপার্জন করে, তাহার পূর্ব পুরুষের খবরের প্রয়োজন কি? একটি মানুষের মনোবৃত্তি, সংস্কৃতি প্রভৃতির সম্যক পরিচয় লাভ করিতে হইলে তাহার পরিবেশ ও বংশ পরিচয়ের সন্ধান অপরিহার্য্য। অনুরূপভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরূপ বুঝিতে হইলে উহার উৎস ও ধারাটিকে জানিতে হইবে। আজকাল গান প্রসঙ্গে আমরা যে স্বর, রাগ, রাগিণী, তাল, লয় প্রভৃতির কথা বলি ঐগুলির আদি রূপ কি ছিল, কেমন করিয়া উহাদের বিবর্তন ঘটিল প্রভৃতি জানা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা ছাড়া, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সুতরাং, আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে এই শাস্ত্রের চর্চা না করিলে চলিবে না।[১২]

উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে ইতিহাস চিন্তায় যে পরিবর্তন এসেছে তারই প্রতিফলন হয়েছে সুরেশচন্দ্রের লেখায় আর তার অনুবাদ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায়: নেশন-এর কাঠামোর মধ্যে সঙ্গীতের আঞ্চলিক, সামাজিক এবং অসাম্প্রদায়িক ইতিহাস ভাবনায়; আর নতুন করে সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্র, শব্দার্থ, তত্ত্বের সঙ্গে বর্তমান চর্চার যোগাযোগ প্রতিস্থাপন করবার প্রচেষ্টায়। এই নতুন ধারার সঙ্গীত লিখনে, মূলত সঙ্গীত এবং আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক, অথবা সঙ্গীত এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভাবনায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতন তৎকালীন হিস্টরিকাল মিউসিকোলজিস্টের প্রভাব পড়ে সুরেশচন্দ্রের লেখায়। ভূমিকায় লিখছেন, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুযায়ী বীণাবাদ্য, শ্রুতি, জাতি ও তালের জ্ঞান মোক্ষলাভের উপায়। প্রেম মানব মনের চিরন্তন, সহজাত ধর্ম। সঙ্গীত প্রেমের জনক ও ধারক। সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতি-র উপলব্ধি মানবজীবনে করুণই প্রধান রস; শৃঙ্গার, হাস্য প্রভৃতি রূপে প্রতীয়মান হয়।

সঙ্গীত রত্নাকর সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। পাঁচ হাজারের বেশি শ্লোক সম্বলিত। অধ্যায়গুলি যথাক্রমে: স্বর, রাগ, প্রকীর্ণ, প্রবন্ধ, তালাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, ও নর্তনাধ্যায়। প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয় ভাগে শাস্ত্র অন্তর্গত বিষয়সমূহের, শব্দার্থের সম্প্রসারণ হয়, যা স্থান পেয়েছে রত্নাকর-এ।

অনুবাদ প্রসঙ্গে কথামুখে সুরেশচন্দ্র জানিয়েছেন (বর্তমান) ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে তার উৎস ও ধারার সন্ধান করা প্রয়োজন। এছাড়াও সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সামাজিক ইতিহাসে।

সুরেশচন্দ্রের ভাবনা কোনোমতেই প্রাদেশিক নয়, কেননা তিনি বিমিশ্র সংস্কৃতির কথা বলছেন। বরং তৎকালীন আঞ্চলিক ও সামাজিক ইতিহাস নিয়ে চর্চা-ভাবনার প্রভাব রয়েছে সুরেশচন্দ্রের কাজে।

প্রসঙ্গত, আদি মধ্যযুগের সঙ্গীত চিন্তা নিয়ে পরবর্তীকালে যারা লিখেছেন, প্রেম লতা শর্মা, লুইস রয়েল, তাঁরা কিন্তু সঙ্গীতের বৌদ্ধিক ইতিহাস আর তার বিবর্তন সরল রেখায় বুঝতে চাননি। রওয়েল-এর প্রত্ন-লিখন সঙ্গীতের কোনো কালানুক্রমিক বর্ণনা নয়; ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ নয় তা, শাস্ত্র অন্তর্গত বিষয়-আশয়ের সাংস্কৃতিক পুনর্মূল্যায়ণ। রওয়েল আলোচনা করেছেন শাস্ত্রের চিহ্নস্বরূপ ও প্রণালীবদ্ধ রীতিনীতি নিয়ে। শাস্ত্র বর্ণিত সাঙ্গীতিক যেসব ধারণা আর তাদের শ্রেণীবিন্যাস, সেসব সরলরৈখিক নয়, আন্তর্জালিক। উদাহরণস্বরূপ —নৃত্য, নৃত্ত ও নাট্যের আন্তর-সম্পর্ক।

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতশাস্ত্র রচনার যে ধারা — নাট্যশাস্ত্র, দত্তিলম, বৃহদ্দেশী, সঙ্গীতমকরন্দ —তার পরবর্তী কালে রচিত সঙ্গীতরত্নাকর। এই শাস্ত্র পাঠে রত্নাকরে আলোচিত বিষয় বস্তু তিনটি বিভাগে (পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত) ভাগ করেছেন সুরেশচন্দ্র। নৃত্য, গীত, ও বাদ্য, এই তিনটি নাদের অধীন। সঙ্গীত এমনকি সমগ্র পৃথিবী নাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর দ্বারা প্রকাশিত হয় বর্ণ। বর্ণ থেকে উৎপন্ন হয় ভাষা। বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোগে সৃষ্টি হয় অলঙ্কার। অনুরণন বা প্রতিধ্বনিহীন অবস্থায় শ্রুত নাদশ্রুতি। গীতে নাদ তিন প্রকার — মস্তকে তার, কণ্ঠে মধ্য, এবং হৃদয়ে মন্দ্র। ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ভেক, গজ, এই সাতটি জীবের ধ্বনি অনুযায়ী সাত স্বর স্বীকৃত। বাদী, সংবাদী, বিবাদী ও অনুবাদী ভেদে স্বর চার প্রকার। সঙ্গীতের উৎস আধ্যাত্মিকতায়। উপনিষদের মতে আনন্দে জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। জাগতিক মায়াজাল ছিন্ন করে সোঽহং তত্ত্বে পৌঁছোবার সোপান রাগ রাগিনী। রাগ রাগিনী শুধু গীত হবে তাই নয়, বিশেষ রূপে তাদের ধ্যানও শাস্ত্র নির্দেশিত। শাস্ত্রে আলোচিত বিষয়-অন্তর্ভুক্ত গায়কের দোষ ও গুণাবলী। বাদ্যগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাদ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলছেন যে বাদ্য বীরেদের উৎসাহদায়ক, মঙ্গলজনক, আনন্দদায়ক, দুঃখ বিনাশক ও নৃত্য-গীতের সহায়ক। সঙ্গীতরত্নাকরের বাদ্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ প্রণালী, বাদনভঙ্গী, হস্ত সঞ্চালন, বোল ইত্যাদি।

সূচনায় সুরেশচন্দ্র দুটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। এক, সঙ্গীতশাস্ত্রে তন্ত্রের প্রভাব। তন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় দেহতত্ত্ব; তান্ত্রিকসাধক দেহে ব্রহ্মাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের আদি রূপ চর্যাগীতিতে ও লোকসঙ্গীত, বিশেষ করে বাউল গানে তন্ত্রের সুর অনুরণিত। রত্নাকরের প্রারম্ভে নাদ, শ্রুতি, স্বর প্রভৃতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে তান্ত্রিক ধারণার অবতারণা করা হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতি ও বৈদেশিক

প্রভাব সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র লিখছেন, কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন ধারায় গ্রীক প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে ইসলামের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরূপ ও স্বাজাত্য, সুরেশচন্দ্র লিখছেন, বজায় রাখা আবশ্যিক। 'মানুষ কখনও কখনও জীবনের তরঙ্গাভিঘাতে নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া আত্মবিস্মৃত অবস্থায় সমাজে সঙ্কর বর্ণের ন্যায় অভিজাত শ্রেণীর বহির্ভূত হইয়া বাস করে। বিশাল ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সঙ্গীত সেই দশা যাহাতে প্রাপ্ত না হয়, তৎ প্রতি আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।' অবশ্য সুরেশচন্দ্রের বক্তব্য নয় সংস্কৃতির দ্বার রুদ্ধ রেখে আত্মতুষ্ট হয়ে কূপমণ্ডুকে পরিণত হওয়া। 'দেশ বিদেশের সংস্কৃতিবাহী বায়ু আমাদের গৃহে মুক্তভাবে প্রভাবিত হইবে; কিন্তু, এই বায়ুবেগে আমরা স্বীয় পদচ্যুত হইব না।'

শাস্ত্রগ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ-এর পাশে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে বাংলায় কোষগ্রন্থ রচনার একটা ধারা চলে এসেছে। সঙ্গীতের ব্যাকরণ, আধুনিক পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে রত্নাকর-এর মতন প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থই সে সবের ভিত্তি। রাগ সঙ্গীত চর্চা আর তার আস্বাদ পেতে হলে সঙ্গীতের পরিভাষা বা ব্যাকরণের প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। শ্রুতি থেকে লিপিবদ্ধ শাস্ত্র, শাস্ত্র নির্গত শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা, অনুবাদের প্রক্রিয়া পরম্পরা ক্রমে চলে এসেছে। সুরেশচন্দ্র অনূদিত রত্নাকরের বঙ্গানুবাদে লেখকের ব্যক্তিভাবনার প্রভাব রয়েছে। আধুনিক যুক্তির আলোয় তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের বিচার করেছেন। সুরেশচন্দ্র লিখেছেন, আধুনিক সঙ্গীতের স্বরূপ বুঝতে হলে করতে হবে তার উৎসমূলের সন্ধান। উৎসের সন্ধানের সঙ্গে মিশে থাকে অনুবাদের গোটা প্রক্রিয়াটাই — ভাষার মধ্যস্থতা, ব্যক্তিচিন্তা, সঙ্গীতের ব্যবহারিক দিক নিয়ে ভাবনা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ শুধু এক ভাষা থেকে আরেক ভাষার অন্তর নয়; আধুনিক প্রয়োগ বা ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রের পুনর্পাঠ।

পুনশ্চ :

সঙ্গীতের উৎসমূল সন্ধানে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধার বা পাঠোদ্ধার অন্য মাত্রা পেলেও উনিশ এবং বিশ শতকের বাঙালী সঙ্গীত তাত্ত্বিকরা ফার্সি বা অন্যান্য স্থানীয় ভাষা যেমন উর্দু, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে ফকিরুল্লার রাগ দর্পণ বা পরবর্তী কালের হাকিম মহম্মদ করম ইমামের মাদনূল মুসীকী (১৮৫৭)-এর মতন গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত গ্রন্থের কমই উল্লেখ পাই বাঙালীদের লেখায়। আধুনিক বাংলায় সেনী সঙ্গীতের কৃতবিদ্য ব্যক্তি, গৌরীপুর-এর জমিদার-পুত্র সঙ্গীতজ্ঞ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লখনউ-এর এই হাকিম মহম্মদ করম ইমাম-এর বইটির সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ করেন।[১৩] মাদনূল মুসীকী পাঠে এনথ্রপলজিস্ট রেগুলা কুরেশি সঙ্গীতসার গ্রন্থ রচনার আদর্শিক ধারার বিপরীতে ব্যক্তিগত চর্চাকেন্দ্রিক বা personal musicology এবং

practice এর কথা বলেছেন।[১৪] বাঙালী এমেচারদের সঙ্গীত লেখনের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ায় নানা রকম জটিলতা থাকলেও তা কখনই প্র্যাকটিস বহির্ভূত নয়। ❑

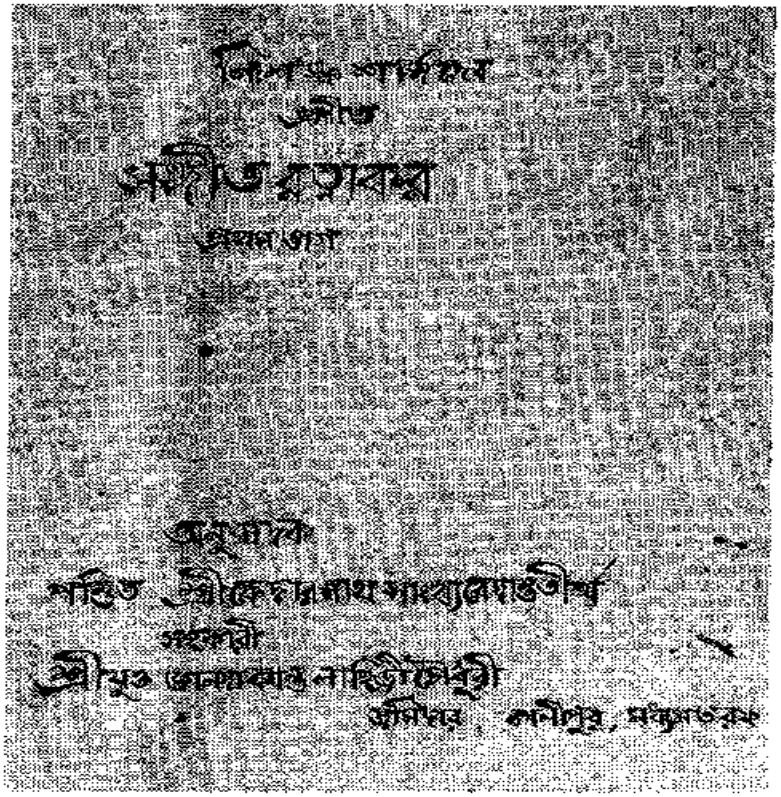

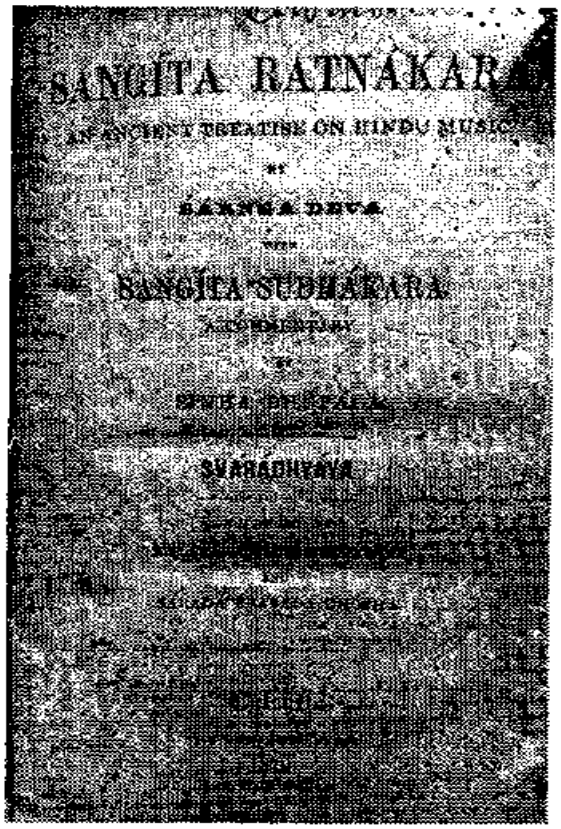

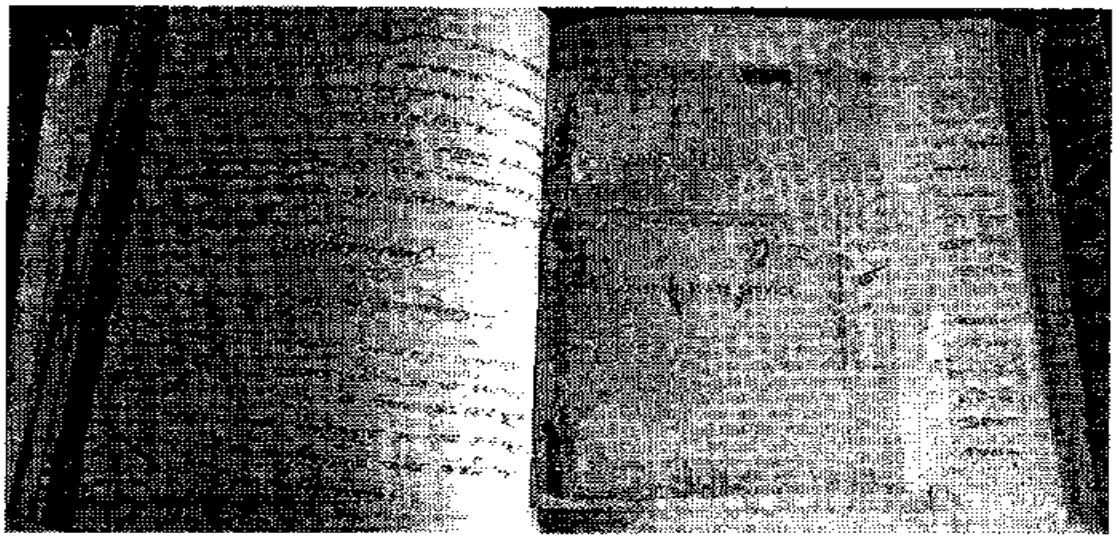

টীকা

১। Bimalakanta Roychaudhuri, Autobiography of a Man, (Kolkata: Imdad-khani School of Sitar, 2006), p. 58, ইংরেজি থেকে অনুবাদ বর্তমান প্রবন্ধকারের

২। দ্রষ্টব্য, 'Defining the Classical: The Nationalist Imperative' in Lakshmi Subramanian, From the Tanjore Court to the Madras Music Academy: A Social History of Music in South India, (New Delhi: Oxford University Press, 2006, Second Edition 2011), pp. 55-83

৩। Richard Williams, 'Music, Lyrics, And the Bengali Book: Hindustani Musicology in Calcutta, 1818-1905', Music & Letters, 97/3 (2016), 465-495

৪। Sagnik Atarthi, 'Whither Musicology? Amateur Musicologists and Music Writing in Bengal', Ethnomusicology Forum, 26/2 (2017), 247-268

৫। Kalivara Vedantavagisa and Sarada Prasad Ghosh ed, SangítaRatnákara: An Ancient treatise on Hindu Music by Sarnga Deva, (Calcutta: The New Arya Press, 1879), p.ii-iii

৬। Sheldon Pollock, The Language of the Gods in the World of Men: Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India, (Ranikhet: Permanent Black, Second Impression 2011), p. 406

৭। Jonathan Katz, 'Music and Aesthetics: An Early Indian Perspective', Early Music, 24/3 (1996), 407-420

৮। Audrey Truschke, Culture of Encounters: Sanskrit at the Mughal Court, (Gurgaon: Penguin Allen Lane, 2016)

৯। Katherine Butler Schofield, 'Reviving the Golden Age Again: "Classicization," Hindustani Music, and the Mughals", Ethnomusicology, 54/3 (2010), 484-517

১০। Kalivara Vedantavagisa and Sarada Prasad Ghosh ed, SangitaRatnakara: An Ancient treatise on Hindu Music by Sarnga Deva, (Calcutta: The New Arya Press, 1879), p. i

১১। Sureshchandra Bandyopadhyay Translated Sangitratnakara, (Calcutta: Rabindrabharati University, 1972), xxxv

১২। তদেব ix

১৩। পরিশিষ্ট ১, Birendra Kishore Roy Chowdhury, Hindusthani Sangeetey Tansener Sthan, 1939, (Kolkata: Thema, 2006)

১৪। Regula Burckhardt Qureshi, 'Other Musicologies: Exploring Issues and Confronting Practice in India' in Nicholas Cook and Mark Everist ed. Rethinking Music, (Oxford: Oxford University Press, 1999, reprinted 2001), pp. 311-335

সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জি

Emmie Te Nijenhuis and Françoise 'Nalini' Delvoye, 'Sanskrit and Indo-Persian Literature on Music', in Bor, Harvey, Nijenhuis ed. Hindustani Music: Thirteenth to Twentieth Centuries, (New Delhi: Manohar, 2010), pp. 35-64

Lewis Rowell, Music and Musical Thought in Early India, (Chicago: University of Chicago Press, 1992)

Mukund Lath, Transformation as Creation, (New Delhi: Aditya Prakashan, 1998)

R.K. Shringy and Prem Lata Sharma ed. Sangīta-Ratnākara of Śārngadeva (Delhi: Motilal Banarsidass, 1978)

কৃতজ্ঞতা : বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী সংগ্রহের সংরক্ষক শ্রীসুভাষ চন্দকে।